বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

ঢাকা মহানগরের পরিবেশ দূষণ : একটি পর্যালোচনা

ব্যোমকেশ তালুকদার*

Environmental Pollution of Dhaka City: A Discussion.

Byomkesh Talukder

Abstract : Dhaka has come to be known as one of the megacities of the world. The scale of pollution is gradually increasing in the City. Like all megacities Dhaka has many serious problems. The environmental problem is one of among them. Dhaka used to be known as a city of greenery but due to over population it has become the most polluted city in the world. The environmental condition of this city is destroying day by day. Now Dhaka City is subject to over population, air pollution, and water pollution, sound pollution and waste pollution. The factors behind these pollutions are different and their impacts on health are also enormous. The pollutions of this city are making it unhealthy for living. For its unhygienic environmental condition the Dhaka City dwellers are facing serious health problems. In this paper attempt has been made to identify the causes of pollutions, their impact and remedies of the environment of Dhaka.

১.০ ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে; এগুলো নিয়ে উন্নত বিশ্বে বিশেষত পশ্চিমা দুনিয়ায় অনেক ঢাক-ঢোল পেটোনো হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে তার কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি, বরং এখানকার অধিকাংশ দেশই ক্রমবর্ধমান মারাত্মক সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত । এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল পরিবেশগত সমস্যা । গোটা বিশ্ব আজ পরিবেশ দূষণের ফলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । এর প্রভাব বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করেছে । আর এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ঢাকা মহানগরী । এক ভয়ানক পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে প্রায় এক কোটি লোকের আবাসস্থল ঢাকা মহানগরী। অবিরাম দূষণের ফলে মহানগরী দ্রুত মানব বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে । বর্তমানে দিনের পর দিন বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, ইত্যাদির ফলে ঢাকার সার্বিক পরিবেশ দূষণ প্রকট আকার ধারণ করছে । নগর পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণের বিষয়টি আজ সারা বিশ্বেই বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে । নগর পরিবেশ দূষণের ফলে নগরবাসীর স্বাস্থ্য আজ হুমকির মুখে বিশেষ করে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে । ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণের মাত্রা বিশ্বের দূষিত নগরীগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ, যা আমাদের সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলছে। বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রম,

* মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বিপিএটিসি,সাভার, ঢাকা

জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম ও ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনষ্টিটিউট এর উদ্যোগে যৌথভাবে প্রকাশিত বিশ্ব সম্পদ ১৯৯৯ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বে মৃত্যু ও রোগব্যাধির প্রায় ২৫ ভাগ ঘটছে পরিবেশের কারণে । এ অবস্থায় নগরের পরিবেশীয় অবস্থা আমাদের সবার মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত ঢাকা শহরের পরিবেশের করুণ অবস্থা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে । বাংলাদেশে নগরায়নের হার খুব দ্রুত যার ফলে বর্তমানে ঢাকা মহানগরে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । ১৯৯১ সালে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ বর্তমানে প্রায় এক কোটি । ঢাকা শহরের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি শহরটিকে নাগরীক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে । ঢাকাবাসীরা পরিবেশের কথা চিন্তা না করেই যত্র তত্র বসতি স্হাপন করে চলছে । যার ফলে ঢাকার পরিবেশের উপর চাপ পড়ছে । ঢাকা শহরের পরিবেশের করুণ অবস্হার জন্য এ শহর বসবাসের উপযুক্ত নয় । নানাবিধ কারণে ঢাকার পরিবেশ দূষণ নগরবাসীর জন্য এক বিড়ম্বনা ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা মহানগরের পরিবেশ দূষণ আলোচনায় এ শহরের জনসংখ্যা, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, অবর্জনা দূষণ, অ্যাপার্টমেন্টের পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করা হবে।

২.০ ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণ

ঢাকার পরিবেশ আজ মারাত্মক দূষণে দূষিত । ঢাকার বহুবিধ পরিবেশ দূষণের মধ্যে নিচের দূষণ প্রধান :-

- জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি,
- বায়ু দূষণ,
- পানি দূষণ,
- শব্দ দূষণ,
- ময়লা আবর্জনার দূষণ ও
- এ্যাপার্টমেন্টের পারিবেশিক সমস্যা ।

৩.০ জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি

ঢাকার জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।১৯৪৭-এ দেশভাগের পর থেকে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সারা দেশ থেকে ক্রমাগত লোক ছুটে এসেছে ঢাকার দিকে। ঢাকার পরিবেশের ক্রমবর্ধমান নাজুক অবস্থার জন্য দায়ী এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৫০ সালে ঢাকার লোকসংখ্য ছিল মাত্র ৪ লাখ ৩০ হাজার, আজ প্রায় প্রায় এক কোটি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে১০ লাখ লোকের একটি শহরে প্রতিদিন দরকার ৬২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন পানি, ২০০ মে. টন খাবার এবং ৯৫০০ মে. টন জ্বালানি এই হিসাব থেকে বুঝা যায় ঢাকাতে প্রতিদিন কি পরিমাণ পানি ও

খাবার প্রয়োজন। আবার শহর যেমন গ্রহণ করে তেমনি বর্জনও করে। এই শহরের বর্জ্য হলো- ৫০ হাজার মে. টন ব্যবহৃত ও নষ্ট পানি, ২ হাজার মে. টন কঠিন বর্জ্য এবং ৯৫০ মে. টন বায়ু দূষক (উৎস:পরিবেশ অধিদপ্তর)। ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি এরূপঃ ১৯৫০ সালে-৪ লাখ ৩০ হাজার, ১৯৬৫ সালে-১০ লাখ, ১৯৭৫-২৩ লাখ, ১৯৮৫-৪৯ লাখ, ১৯৮৯-৬৫ লাখ, ১৯৯৬-৮০ লাখ, ২০০০ সাল- সম্ভাব্য ১ কোটি ১১ লাখ। ১৯৮৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক হিসাব মতে নগরায়নের ফলে ২০০০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৬%, ২০১৫ সালে ৩৭% এবং ২০২৫ সালে ৪৫-৫০% লোক শহরে বাস করবে। এই হিসাবেই দেখা যায় ২০২৫ সালে বাংলাদেশের শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার ১/৩ অংশ ঢাকা মহানগরীতে বসবাস করবে। সারণী -১ এ ১৯৫১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখানো হল ।

সারণী-১ : জনসংখ্যা /ঢাকার আয়তনঃ ১৯৫১-২০২৫ ।

বৎসর	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গমাইল)	ঘনত্ব (জনসংখ্যা/বর্গমাইল
১৯৫১	৩৩৫৯২৮	২৮	১১৯৯৭
১৯৬১	৫৫০১৪৩	৩৫	১৫৭১৮
১৯৭৪	১৬০৭৪৯৫	১২৫	১২৮৬০
১৯৮১	৩৪৪০১৪৭	১৫৫	২১৯৩৫
১৯৮৯	৫৫০০০০০	১৫৫	৩৫৪৮৪
২০০১	৮৪০০০০০	১৫৫	৫৪১৯৪
২০২৫ (ক)	১২৫০০০০০ ১৫০০০০০০	১৫৫	৪০৬৪৫-৭৭৪
(খ)	২০০০০০০০ ৩০০০০০০০	২০০-৩০০	১০০০০০-১২০০০০
(গ)	২০০০০০০০ ৩০০০০০০০	৬০০ গ্রামের আয়তনসহ	৩৩৩৩৩-৫০০০০

উৎস: Islam, N 1996 "Dhaka: From City to Megacity", Dhaka, Urban studies programme, Department of Geography, University of Dhaka.PP:214.

৪.০ বায়ু দূষণ

নগরায়ন ও মোটরযান পরিবহণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । ঢাকা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক কালে মোটরযান পরিবহণ বৃদ্ধি পেয়েছে । ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকাসহ দেশের মোট ছয়টি শহরে

দূষণ নির্গমনকারী মোটরযানের একটি অনিয়মিত জরিপ গ্রহণ করে। এই জরিপে চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুরে বিভিন্ন প্রকারের সর্বমোট ১৯,৭৫৭টি মোটরযান পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষীত মোটরযানসমূহের মধ্যে ১৩,৩০৮টি (৬৭.৪%) দূষক নির্গমন করছিল এবং তার অর্ধেকের বেশী ছিল ট্রাক ও তার পরবর্তী স্থানে ছিল মিনিবাস (সারণী-২) । ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধে (জানুয়ারী-জুন) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ সম্পর্কীয় এক জরিপ অনুষ্ঠিত হয় । এই জরিপ একটি বিদেশী কনসালটেন্ট- এর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এতে সালফার ডায়অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ এবং ভাসমান বস্তুকণাসমূহের পরিমাপ করা হয় (Bashar and Reazuddin, 1990)। এই জরিপ ঢাকা শহরের তিনটি এলাকা বাতাসের নমুনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিবার্চন করা হয়। এই এলাকাগুলো হচ্ছে ঃ

- মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
- লালমাটিয়া আবাসিক এলাকা এবং
- তেজগাঁও শিল্প এলাকা

সারণী -২ : মোটরযানের নমুনা ।

মোটরযানের নমুনা	শতকরা হার
ট্রাক	৫১.৮
মিনিবাস	২৬.৯
বাস	৯.৫
বেবীট্যাক্সি	৪.৯
সেলুনকার	১.৫
মোটর সাইকেল	১.৫
অন্যান্য	৩.৯
মোট	১০০.০

উৎস: পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০ ।

ছয় মাস ব্যাপী এই জরিপে, প্রতি মাসে প্রতি এলাকা থেকে বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করে উপরে উল্লিখিত দূষকসমূহের পরিমাপ করা হয় এবং দূষকের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের সাথে তুলনা করা হয় । এই জরিপে দেখা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে, অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত

সময়ে তিনটি এলাকাতেই ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত গড় পরিমাণ (৬০-৯০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার) অপেক্ষা অধিক ছিল । আপেক্ষিকভাবে মতিঝিল ও তেজগাঁও এলাকায় বস্তুকণার পরিমাণ লালমাটিয়া অপেক্ষা বেশী ছিল । বস্তুতপক্ষে, জানুয়ারী মাসে মতিঝিলের বায়ুতে ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ ছিল প্রতি ঘন মিটারে ৫৭০ মাইক্রোগ্রাম । মে মাস থেকে বায়ুর গতিবেগ বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় বস্তুকণায় পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা নির্দিষ্ট উপরের সীমায় নিকট চলে আসে । বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকায় ভাসমান বস্তুকণার আধিক্য অধিকসংখ্যক মোটরযান পরিবহণের কারণে ঘটেছে এবং তার সাথে ঐ সকল এলাকায় নির্মাণাধীন বিল্ডিংসমূহ থেকেও প্রচুর বস্তুকণা বায়ুতে সংযোজিত হয়েছে । উল্লিখিত জরিপে সালফার ডায়অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের যে পরিমাণ পরিমাপ করা হয় তা অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত সীমারেখা অতিক্রম করে নাই । পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশের জন্য কাল ধোঁয়া নির্গমনের সীমা নির্ধারণ করেছে ৬৫ এইচ,এস,ইউ* । পরীক্ষিত ৯০৮টি মোটরযানের মধ্যে মাত্র ১২৬টি (১৩.৯%) মোটরযান থেকে নির্গত ধোঁয়া এই সীমারেখা অতিক্রম করে নাই ।

সারণী - ৩ : ঢাকা শহরের মোটরযান নির্গতকারী ধোঁয়া পরিমাপ, ১৯৯০

মোটরযান	সংখ্যা	< ৬৫	> ৬৫	>৭৫	>৯০	>১০০
এইচ, এস,ইউ পরিমাণ ধোঁয়া নির্গতকারী মোটরযানের সংখ্যা						
বাস	২৮১	৪০	২৪১	৪০	৮৫	১১৬
মিনিবাস	৩০৬	৪৯	২৫৭	২৭	১০১	১২৯
ট্রাক	১৯৫	১৯	১৭৬	১১	৩৯	১২৬
টেম্পো	২৫	৫	২০	১	৪	১৫
জীপ	৪১	৩	৩৮	১	১৩	২৪
মাইক্রোবাস	৫৭	১০	৪৭	৩	১৪	৩০
পিক-আপ	৩	--	৩	--	--	৩

উৎস: পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০ ।

প্রধান দূষণকারী মোটরযান হচ্ছে ট্রাক এবং বাস/মিনিবাস (সারণী - ৪) তবে দুই-স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পোও প্রচুর সংখ্যায় দূষণকারীরূপে চিহ্নিত হয় । ঢাকা শহরে এত অধিক অনুপাতে কাল ধোঁয়া নির্গমনকারী মোটরযান রাস্তায় চলাচল করার ফলে প্রমাণ হয় যে, কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা ঢাকা নগরীর

* এইচ,এস,ইউ (H .S .U) – Hartridge Smoke Unit

বায়ু দূষণ এক ভয়াবহ পর্যায়ের দিকে এগুচ্ছে এবং একথা বলা যায় যে, নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার সাথে মোটরযানের সংখ্যাবৃদ্ধি ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিকে আরও জটিলতর করবে ।

সারণী - ৪ : কাল ধোঁয়া নির্গমনকারী যান গণন ।

মোটরযান	গণনাকৃত যানের সংখ্যা	কাল ধোঁয়া নির্গমনকারী যান (শতকরা হার)
বাস/মিনিবাস	১২০	৮৫
ট্রাক	১২০	৮৮
প্রাইভেট গাড়ী	১২০	৪২
বেবী ট্যাক্সি	১২০	৮২
টেম্পো	১২০	৮৬
মোটরসাইকেল	১২০	৭২

উৎস: পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯২ ।

ভিয়েনা কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের একটি সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল থেকে এক ভয়াবহ তথ্য পাওয়া গেছে যে, ঢাকা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক নগরী। উল্লিখিত গবেষণা সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, ঢাকা মহানগরীতে বায়ু দূষণের পরিমাণ মেক্সিকো সিটির চেয়ে বেশী। এতদিন মেক্সিকো সিটিকে বিশ্বের সবচেয়ে পবিবেশগত বিপর্যয়কর মহানগরী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অথচ মেক্সিকো সিটিতে যেখানে প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে সীসার ঘনত্ব ৩৭৩ এনজি সেখানে ঢাকায়-এর পরিমাণ বর্তমানে ৪৬৯ এনজি। পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় দপ্তরের সর্বশেষ সীমিত মনিটরিং-এ ঢাকার প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে সীসার ঘনত্বের পরিমাণ থেকে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তা সারণী-৫-এ তুলে ধরা হল ।

সারণী-৫ : ঢাকার প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে সীসার ঘনত্বের পরিমাণ।

এলাকা	সালফার অক্সাইডের পরিমাণ	বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা (প্রতি ঘনমিটার)	সহনীয় মাত্রা
ফার্মগেট, আসাদগেট		সহনীয় মাত্রার৪/৫ গুণ বেশি সালফার	৪০০ মাঃ গ্রাঃ প্রতি ঘনমিটারে
ফার্মগেট, আসাদগেট	৩ থেকে ৫ গুণ বেশি বিদ্যমান		১০০মাঃ গ্রাঃ প্রতি ঘনমিটারে

উৎস: পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯০ ।

এই মনিটরিংএ দেখা যায় দূর পাল্লার যানবাহন নির্গমন পথ, যেমনঃ ফার্মগেট ও আসাদগেট ইত্যাদি এলাকায় প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ভাসমান বস্তুকণার (সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট মেটার) পরিমাণ সহনীয় মাত্রার (৪০০ মাঃ গ্রাঃ প্রতি ঘন মিটারে) ৪/৫ গুণ বেশি (সারণী - ৫) এবং সালফার অক্সাইডের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার (১০০ মাঃ গ্রাঃ প্রতি ঘন মিটারে) ৩ থেকে ৫ গুণ বেশি বিদ্যমান থাকছে। অন্যদিকে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে কম । বাণিজ্যিক এলাকাসমূহে, গুলিস্তান, পল্টন ও মতিঝিল ইত্যাদি এলাকায় বায়ু দূষণের মাত্রা মিরপুর রোডের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। তবে সর্বত্রই সহনীয় মাত্রার ২/৩ গুণ বেশি । লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই মনিটরিং - এ তেজগাঁও শিল্প এলাকার বাতাসে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট মেটারের পরিমাণ যে এলাকায় যানবাহন বেশি চলাচল করে তার চেয়ে বেশ কম । এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, ঢাকার সাম্প্রতিক বায়ু দূষণের জন্য দায়ী মূলত যানবাহন । ঢাকা মহানগরীর বাতাস কত বিষাক্ত তা এ উদাহরণ থেকে বোঝা যায় ঢাকার রাজউকের সামনে বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইডের ঘনীভবন ৪৪১.৬৭ ইউজি/এম^{৩} এসে দাঁড়িয়েছে । অবশ্য ফার্মগেট এলাকায় ঘনীভবন ৫৪০.৯৮ ইউজি/এম^{৩} (পরিবেশবাদী সংগঠন সুন্দরভূবন, ২০০২ইং) ।

৪.১ বায়ু দূষণের কারণ

ঢাকার বায়ু দূষণে নিচের কারণগুলো দেখা যায় ।

- যানবাহনের কালো ধোঁয়ো ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান কারণ। সায়েদাবাদ, গাবতলী, মহাখালী, তেজগাঁ, ও গুলিস্তানসহ নগরীর বিভিন্ন টার্মিনাল, অনেকগুলো পেট্রোলপাম্প ও সার্ভিস ষ্টেশনে একদল টোকাই সর্বদা পরিত্যক্ত মবিল সংগ্রহ করে বাস, কিংবা মোটর গাড়ি থেকে । সংগৃহীত এই 'পোড়া মবিল' চলে যায় 'মবিল প্রক্রিয়াকরণ' এলাকায় । তারপর এই 'দ্বিতীয় প্রজন্মের মবিল' ক্রেতা সাধারণকে গছিয়ে দেয়া হচ্ছে । পোড়া মবিলের গাড়িটি কালো ধোঁয়া উদগীরণ করে ছুটে চলেছে ঢাকার বুকে । দূষিত হচ্ছে বায়ু । বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ঢাকার বাতাসে সিসার পরিমাণ বর্তমান বিশ্বে সর্বোচ্চ বলে দেখানো হয়েছে । দেশের ৪ লাখ যানবাহনের যে পৌনে ২ লাখ যানবাহন ঢাকা শহরে চলাচল করে সেগুলোই মূলত এই বায়ু দূষণের

মূল উৎস । ঢাকার রাজপথে চলমান যানবাহনের চারটি শ্রেণী রয়েছে । এর মধ্যে এক একটা শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাতাসের ক্ষতি করে। যেমন :-

১. রিকশা ও ভ্যানগাড়ি হলো পরিবেশ সহায়ক ।

২. মিশুক, মোটর সাইকেল, বেবিট্যাক্সি ও টেম্পো বায়ু দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী ।

৩. মোটরগাড়ির গড় দূষণ টেম্পো স্কুটারের চেয়ে কম হলেও সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দূষণে এদের অবদান অনেক ।

৪. কারিগরী দিক থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের বাস ও ট্রাক কম ক্ষতিকর হওয়ার কথা থাকলেও মূলত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এরাও বায়ুদূষণে ভাল ভূমিকা রেখে চলেছে ।

- মূলত সড়ক যন্ত্রযান এবং শিল্প কারখানা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ । এরাই বাতাসে সীসা ছড়াচ্ছে । প্রতিরোধ আইন থাকা সত্ত্বেও শহরে প্রতিদিন হাজার হাজার বাস, ট্রাক, লরি, জীপ, কার, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা অবাধে কাল ধোঁয়া নিঃসরণ করে পরিবেশকে দূষিত করছে । বিশেষ করে হাজার হাজার অটোরিক্সা জ্বালানি হিসেবে লুব্রিক্যান্ট অয়েলের সাথে কেরোসিনের মিশ্রণ ঘটানোর ফলে এ থেকে চরম বিপজ্জনক মাত্রার সীমা নিঃসরিত হচ্ছে এবং বায়ু দূষিত হচ্ছে ।

- বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য সে সব আইন হয়েছে তার সঠিক প্রয়োগ না থাকার কারণে বায়ু দূষণ বাড়ছে। আইনগুলোর কোন প্রয়োগ নেই। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য আইন প্রয়োগের সঙ্গে বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বি,আর,টি,এ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডি,এম,পি) ও পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই।যার ফলে বায়ু দূষণ বাড়ছে। সারণী-৬-এ বায়ু দূষক, উৎস ও বায়ু দূষণের প্রভাব দেখানো হল।

- ঢাকার বায়ু দূষণের জন্য ঢাকার চারপাশ্বের ইটের ভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া,গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের জ্বালানীর ধোঁয়াও অনেক দায়ী।

সারণী - ৬ ঃ বায়ু দূষক, উৎস এবং বায়ু দূষণের প্রভাব ।

দূষকসমূহ	উৎস	প্রভাব
ভাসমান বস্তুকণা (SIM)	যান্ত্রিক যানবাহন, কাঠ-পুড়ানো শিল্পকারখানার কার্যক্রম	শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন, গলার irritation, অ্যাজমা
সালফার ডাইঅক্সাইড	যানবাহন (ডিজেল ব্যবহার) ফ্যাক্টরী নির্গমন (emissions)	লাঙ্গের (lung) স্থায়ী ক্ষয় ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন, ব্রনক্রাইটিস (Bronchitis) , ইমফেজেমিয়া (Emphysema), অ্যাজমা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস, সিম ও টমেটোর স্পট
নাইট্রোজেন অক্সাইড	যান্ত্রিক যানবাহন পাওয়ার ষ্টেশন	শ্বাসতন্ত্রের রোগ, বক্ষব্যাধী, চোখের ইরিটেশন (irritation), মাথাব্যাথা, সিম ও টমেটোর স্পট
সীসা	উইন্ডালিন ডাষ্ট যানবাহণ, কয়লা ও কাঠ পুড়ানো ধাতু উৎপাদন, ফসফেট সার	কেন্দ্রিয় নার্ভ সিষ্টেমের সংক্রমন, উচ্চ রক্ত চাপ Renal Damage, পুর্নবয়স্কের চেয়ে শিশুর ৩ সারণী Risk এ গাছের উপর প্রভাব
কার্বন মনোক্সাইড	পেট্রোল যানবাহন (২ এবং ৩ হুইলারস্)	রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা কমে যাওয়া Exacerbates heart Disorders
অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন	ডিজেল ইঞ্জিন এর নাপুড়ানো জ্বালানী	ঘুম ঘুম ভাব চোখ জ্বালা পোড়া
বেনজিন	Unleaded পেট্রোল	Carcinogens কেন্দ্রীয় নার্ভ সিষ্টেমের সংক্রমন
ওজন	সূর্যের উপস্থিতিতে এবং এর মধ্যে বিক্রিয়া	এর কার্যকরীতা হ্রাস অ্যাজমা

উৎস : UNEP 2001: State of the Environment – Bangladesh; UNEPRRC, AP Thailand.

৪.২ বায়ু দূষণে সৃষ্ট সমস্যা

ঢাকা মহানগরে বায়ু দূষণের সবচেয়ে মারাত্মক উপাদান হচ্ছে সীসা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক ডাঃ রুহুল আমিন বলেন, সীসা এমন একটি মারাত্মক বিষাক্ত উপাদান যা সংক্রমনের ফলে মানুষের :-

১. ক্ষুধা ও যৌন ক্ষমতা লোপ পায় ।

২. শারীরিক দুর্বলতা, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয় ।

৩. মাথা ধরা, মাথা ঘোরা বৃদ্ধি পায় ।

৪. চোখ জালা করে ।

৫. নাক দিয়ে পানি পড়ে ।

৬. বমি বমি ভাব, কাশি ইত্যাদি হয় ।

৭. শ্বাসকষ্ট, গলাব্যথা হয় ।

৮. রক্তশূন্যতা, ক্যান্সার দেখা দেয় ।

৯. হৃদরোগ এবং রক্ত প্রবাহে বিষক্রিয়ার মতো নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

উপরের স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য এককভাবে শুধু সীসাই দায়ী নয়, কার্বনডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী । যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমি অব সাইন্স-এর মতে শিশুদের রক্তে দশমিক ০৯ পিপিএস সীসার উপস্থিতি থাকলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । মেক্সিকো সিটির অধিবাসীদের রক্তে গড় সীসার উপস্থিতি দশমিক ২৩ । সেই হিসেবে ধরে নেয়া যায় আমাদের রক্রে সীসার উপস্থিতি মেক্সিকোর চেয়ে ভয়াবহ । ঢাকার অধিবাসীদের অবস্থা কতটা বিপজ্জনক তা আরো একটি তথ্য থেকে অনুমান করা যায় ভারতের দিল্লী মহানগরীতে বায়ু দূষণের কারণে ৭ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে । ঢাকা মহানগরীতে বায়ু দূষণের কারণে আমাদের দেশে কতো লোক মারা যাচ্ছে তার কোন হিসাব করেনি কেউ । নগরীর বাতাসে অতি মাত্রায় ধুলির কারণে গত ২ বছরে এখানে হাঁপানি রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে । ডাক্তারদের মতে, হাঁপানিতে আক্রান্ত শিশু রোগীর সংখ্যা ঢাকা শহরে দিন দিন বাড়ছে । ঢাকা শহর বায়ু দূষণে যে সত্যিই একটি গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে ডাক্তারদের এই তথ্য সেই অভিমত সমর্থন করে । এদিকে প্রতি মাসেই ঢাকা নগরীতে হাঁপানি রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । ঢাকাকে ধূলি ও ধোঁয়াশামুক্ত করতে না পারলে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন রোগের ফলে মানুষের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়বে যা সামগ্রীক ভাবে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত করবে । সারণী -৭-এ ঢাকা মহানগরীর বায়ু দূষণের কারণ, দূষক, ও দূষণের প্রভাব দেখানো হলো ।

সারণী - ৭ : বায়ু দূষণের কারণ ও বায়ু দূষক ও দূষণে সৃষ্ট সমস্যা ।

কারণ	দূষক	দূষণে সৃষ্ট সমস্যা
নগরায়ন	যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া বৃদ্ধি	নগরের বায়ুর গুণাগুণ হ্রাস
শিল্প দূষণ	SO2, NOy, Pax, গ্যাস ও বাষ্প নির্গমন	বায়ুর গুণাগুণ হ্রাস • মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর • উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি ও গুণাগুণ ব্যাহত • ইকোসিষ্টেম ব্যাহত • বিল্ডিংয়ের উপাদানের ক্ষতি
যানবাহন থেকে নির্গমন	PM, CO, NOx, SO2, VOC	• মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর • উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি ও গুণাগুণ ব্যাহত • ইকোসিষ্টেম ব্যহত • বিল্ডিংয়ের উপাদানের ক্ষতি
ইটের ভাটা	PM, CO, NOx, SO2	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি
ইমারত নির্মাণ	PM	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি
উন্মুক্ত বর্জ্য নিক্ষেপ	গ্যাস সমূহ বাষ্পঃ দুর্গন্ধ	বায়ুর গুণাগুণ হ্রাস
কাঠ/বায়োগ্যাস/কয়লা ব্যবহার	PM,VOC, SOx	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি
জ্বালানীর গুণাগুণ	VOC+ অন্যান্য	মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি

উৎসঃ SOE Study Team

৪.৩ বায়ু দূষণ থেকে রক্ষার উপায়

ঢাকা মহানগরে বায়ু দূষণের প্রধান কারণ হলো যানবাহন । আর যানবাহন থেকে সৃষ্ট দূষণের কারণ গুলোর একটি হলো এর কারিগরী । মোটরগাড়ির ইঞ্জিন একটি

নির্দিষ্ট মাত্রার বায়ু দূষণ করবেই । কিন্তু আমাদের দেশে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ত্রুটিযুক্ত জ্বালানি, পোড়া মবিলের অকার্যকরী জ্বালানীর ব্যবহার, ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত লোড চাপানো ও সর্বোপরি সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব । জ্বালানীতে ভেজাল না মেশানো হলে, পাঁচ টনের অতিরিক্ত যাত্রী বা মাল বোঝাই না হলে টেকনিক্যাল দূষণ ছাড়া অতিরিক্ত দূষণ সহজে কমানো যায় । এ ক্ষেত্রে যানবাহনের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণও পরিবেশকে সহনীয় রাখতে অনেকাংশে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম । ঢাকা শহরকে বায়ু দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্হাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ।

- ☐ সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও যানবহনের ফিটনেসের যথাযথ তদারকী করা।
- ☐ ইটের ভাটায় ইট পোড়ানোতে কাঠের বদলে গ্যাসের ব্যবহার ।
- ☐ বর্জ্য আবর্জনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ।
- ☐ শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকারক গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ ।
- ☐ রাস্তাঘাট ধুলাবালি মুক্ত করা ।
- ☐ পরিকল্পিত নগরায়ন, জনসচেতনতা ও পরিবেশ আইন যথাযথ মেনে চলা ইত্যাদি ।

৫.০ পানি দূষণ

ঢাকা শহরে বর্তমানে পানিদূষণ পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত । ওয়াসা কর্তৃক সাপ্লাইকৃত পানি ধীরে ধীরে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ছে । বিভিন্ন সময় ওয়াসার পানির সাথে কেঁচো, সাপ, শেওলা, নদীর ঘোলা পানি, এমনকি সুয়ারেজ লাইনের ময়লা পাওয়ার সংবাদও পত্রিকাতে প্রকাশ হয়ে আসছে । নগরীর লক্ষ লক্ষ টন ময়লা আবর্জনা প্রতিদিন বুড়িগঙ্গা নদীতে পানির সাথে মিশছে । এ ছাড়াও শিল্প কারখানা থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার ঘনমিটার উচ্চ মাত্রার দূষিত বর্জ্য ঢাকার আশপাশের নদীতে মিশ্রিত হচ্ছে (সারণী-৮)।

সারণী-৮ : প্রতিদিন বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে মিশ্রিত দূষিত বর্জ্যের পরিমাণ ।

শিল্প কারখানার অঞ্চল	দূষিত বর্জ্যের পরিমাণ
হাজারীবাগের ট্যানারী	প্রতিদিন ২০ হাজার ঘনমিটার
তেজগাঁও শিল্প এলাকা	প্রতিদিন ৫ হাজার ঘনমিটার
নারায়ণগঞ্জের শিল্প কারখানা	প্রতিদিন ৩ হাজার ঘনমিটার

উৎস : পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০০০ ।

ঢাকার পাগলা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আমাদের দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কিন্তু বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার পাগলা পয়ঃপরিশোধন কেন্দ্র কাজ করে না যার ফলে পয়ঃনিস্কাশন থেকে ঢাকার পানি দূষিত হচ্ছে। পুরোনো ঢাকায় প্রায় ১৫ হাজার কাঁচা পায়খান রয়েছে যাদের বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় মিশছে এবং ঢাকার ভূগর্ভস্থ, ডোবা ও নালার পানিকে দূষিত করছে। শহরের ময়লা-আবর্জনা সরাসরি বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলা হয়। ঢাকার বিভিন্ন নলকূপ থেকে সরবরাহকৃত পানিতে ক্ষতিকর কলিফর্ম জীবাণু পাওয়া গেছে উল্লেখযোগ্য হারে। মিরপুর ৬নং সেকশনের ১৬নং পাম্প এবং এফডিসির পাম্পের পানি কলিফর্মের পরিমাণ প্রতি মিলি লিটারে ৩০-৩৫০টি। অথচ গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ৪টি। অবশ্য কাকরাইল ও সায়েদাবাদ পাম্পের সরবরাহকৃত পানিতে কলিফর্মের মাত্রা গ্রহণযোগ্য। আবার ওয়াসার গভীর নলকূপগুলোর অধিকাংশগুলোতে ক্লোরিনেশন সেট নেই কিংবা অকেজো (পরিবেশ অধিদপ্তর)। পরিবেশ অধিদপ্তরের পুরোনো এক রিপোর্টে ওয়াসার পানিতে দস্তার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে বেশি বলা হয়েছে। তবে ওয়াসার পানিতে ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ ১.০৩ থেকে ২.২৪ পিপিবি, যা গ্রহণযোগ্য মাত্রার অনেক কম। সারণী-৯ এ ঢাকাকে বেষ্টনকারী বিভিন্ন নদীর দূষণের কারণ ও মাত্রা দেখানো হল।

সারণী - ৯ : ঢাকার নদীসমূহের দূষণের কারণ ও দূষণের মাত্রা ।

নদীর নাম	দূষণের কারণ	মন্তব্য
বুড়িগঙ্গা	ঢাকার ময়লা আবর্জনা ও হাজারীবাগের ট্যানারী	সবচেয়ে বেশী দূষিত ঋতুভেদে দূষণের তারতম্য ব্যাপক
শিতলক্ষ্যা	ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কাখানা, তেল টার্মিনাল, নারায়নগঞ্জ ও ডেমরার শিল্প কারখানা	সবচেয়ে বেশী দূষিত ঋতুভেদে দূষণের তারতম্য আছে
বালু	তেজগাঁও ও টংগীর শিল্পকারখানা	ব্যাপক ভাবে দূষিত
তুরাগ	টংগী, সাভার ও মিরপুরের শিল্প স্থাপনা	দূষিত

উৎস : UNFP 2001.

সারণী - ১০ : পানি দূষণের কারণ, পানির অবস্থা ও পানি দূষণের প্রভাব।

দূষণের কারণ	অবস্থা	ফলাফল
• ইনডাষ্ট্রিয়াল Effluent • ট্যানারী, গার্মেন্টস, ঔষধ, প্রসাধন, অন্যান্য শিল্প • এগ্রোক্যামিক্যাল • নৌযান থেকে নির্গত তেল • পয়ঃনিষ্কাশনের পানি • শুষ্ক মৌসুমে নদীতে নিম্ন পানি প্রবাহ • জনসংখ্যার চাপ	• শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানির গুণাগুন হ্রাস • পানির দূষণ বৃদ্ধি	• নগরের পানির উৎসের উপর চাপ । • পোনা মাছের মরণবৃদ্ধি, মাছের গমনাগমন হ্রাস ও মাছের গুণাগুন হ্রাস। • মাছের আবাসস্থলের গুণাগুন হ্রাস । • মাটির উৎপাদন হ্রাস । • জলজ ইকোসিষ্টেম ব্যহত । • পানিবাহিত রোগের প্রকোপের সম্ভাব্য বৃদ্ধি। • সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ।

উৎস : : SOE Study Team

৫.১ পানি দুণের কারণ

ঢকার পানি দূষণের কারণগুলো আলোচনা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে ঢাকার পানি দূষণের জন্য দায়ী করা যায় :-

- ট্যানারী থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ ।
- গার্মেন্টস, ডাইং ও শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত মারাত্মক দূষণীয় রাসায়নিক পদার্থ ।
- পয়ঃনিষ্কাশনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ ।
- গৃহস্থালীর ও হাট বাজার থেকে নির্গত ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি ।

৫.২ পানি দূষণে সৃষ্ট সমস্যা

ঢাকার পানি দূষণের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা হল :-

- বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত পানি বুড়িগঙ্গার পানির সাথে মিশে নদীর পানির সলিডিটি বেড়ে গেছে ।
- নদীর পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কমে গেছে । যেখানে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য নদীর পানির সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ প্রতি লিটার সর্বনিম্ন ৬ মিঃ গ্রাম, সেখানে বুড়িগঙ্গা নদীতে এর পরিমাণ মাত্র ২মিঃ গ্রামে এসে পৌঁছেছে ।
- ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর পানিতে শুষ্ক মৌসুমে কোন জলজপ্রাণী বাঁচতে পারে না বলে প্রাণী বিজ্ঞানীরা শংকা প্রকাশ করেছেন ।
- পানি বাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৫.৩ পানি দূষণ থেকে রক্ষার উপায়

ঢাকার পানি দূষণ রোধ করার জন্য নিচের ব্যবস্হাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :-

ট্যানারী স্থানান্তর করা ।

- পানি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ।
- সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।
- পরিবেশ আইন যথাযথ ভাবে মেনে চলা ।
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ।
- শিল্প বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ করা ও
- গণ সচেতনতা ইত্যাদি ।

৬.১ শব্দ দূষণ

বায়ু দূষণের পাশাপাশি মহানগরীতে শব্দ দূষণ ভয়াবহ স্তরে পৌঁছেছে । শব্দ দূষণের ভয়াবহতা বায়ু দূষণের চেয়ে কম নয় । বিভিন্ন ভাবে সৃষ্ট এই শব্দ দূষণের ফলে নগরবাসী বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রতিনিয়ত ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে। ঢাকায় বায়ু কিংবা পানির মতো এর কোলাহলও মারাত্মক দূষণে দূষিত । ঢাকার মানুষ প্রতিনিয়ত যে তীব্র শব্দে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা হলো

গাড়ির হর্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি সীমা ৬০ -৬৫ ডেসিবেল। আর ঢাকা শহরে শব্দের গড়মাত্রা ১০০-১১০ ডেসিবেল । বছর পাঁচেক আগে ১৯৯৭ সালে ঢাকা মহানগরীতে শব্দ দূষণ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে একটি জরিপ পরিচালিত হয়েছিল । উল্লিখিত জরীপে দিন ও রাতে ঢাকার বিভিন্ন স্হানের শব্দের মাত্রা ধারণ করা হয় (সারণী -১১) ।

সারণী - ১১ : স্হান ও সময় অনুযায়ী শব্দের সহনীয় মাত্রা

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	ডেসিবল এককে ধার্যকৃত সীমা	
		দিন (সকাল ৬টা-রাত ৯টা)	রাত (৯টা-ভোর ৬টা)
ক।	নীরব এলাকা	৪৫	৩৫
খ।	আবাসিক এলাকা	৫০	৪০
গ।	মিশ্র এলাকা (আ/এ, শিল্প বা/এ)	৬০	৫০
ঘ।	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
ঙ।	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

উৎস ঃ ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ, ২০০২ ।

জরিপকৃত তথ্য থেকে তখন জানা গিয়েছিল, নগরীতে শব্দের দূষণমাত্রা সর্বোচ্চ ৭৫ ডেসিবল এবং গড়ে ৬৭ ডেসিবল । ঢাকার হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শব্দের গ্রহণমাত্রা শিল্প এলাকার গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল এলাকায় দিনের বেলায় শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৪৫ ডেসিবল (সারণী-১১) । কিন্তু এসব এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ গড় মাত্রা হচ্ছে ৭০ থেকে ৭৫ ডেসিবল । বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের জন্য শব্দের সহনীয় মাত্রা হচ্ছে ৪৫ ডেসিবল । মানুষের স্বাভাবিক শব্দগ্রহণ ক্ষমতা ২০ থেকে ২ হাজার সাইকেল/সেকেন্ড অথচ গাড়ির হর্ন, বিশেষ করে হাইড্রলিক হর্নের শব্দের কম্পনমাত্রা হচ্ছে ২০ হাজার সাইকেল/সেকেন্ড । এই হাইড্রলিক হর্ণ ঢাকার শব্দ দূষণের প্রধান কারণ । শব্দ দূষণের ফলে বর্তমানে ছোট-বড় বিভিন্ন উপসর্গে আক্রান্ত নগরবাসীর সংখ্যা ১৭% । ১৯৯৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকার শব্দ দূষণ রোধে কোন প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি । দূষণ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলেও জানা

যায়নি । সুতরাং ৫ বছর পর এই ২০০৩ সালের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে এমন আশঙ্কা করা নিশ্চই অমূলক হবে না । পরিবেশ দূষণ, বিশেষ করে পানি, বাতাস ও মাটি (পলিথিনের কারণে) দূষণের বিরুদ্ধে ঢাকার নাগরিকগণ যে পরিমাণ শঙ্কিত, সতর্ক ও সোচ্চার হয়ে উঠেছেন শব্দদূষণের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই নিঃশঙ্ক, নিরুদ্বেগ ও নির্লিপ্ত রয়েছেন বলে মনে হয় । চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের এক নম্বর শত্রু হচ্ছে হাইড্রোলিক হর্ন । শব্দ যেমন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, আনন্দ দিতে পারে, তেমনি বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে, শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণও হতে পারে ।

৬.১ শব্দ দূষণের কারণ

ঢাকা মহানগরীতে শব্দ দূষণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে :-

- গাড়ীর হাইড্রলিক হর্ণ প্রধান । ঢাকায় ভয়ঙ্কর হাইড্রলিক হর্ন বাজাতে বাজাতে চলাচল করছে লক্ষাধিক যানবাহন । যা মানুষের গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে ৩৩ শতাংশ বেশী। পথে পথে মোড়ে মোড়ে নানা যানবাহনের বিরক্তিকর শব্দ এবং হর্ণের আওয়াজই মূলত ঢাকার শব্দদূষণের প্রধান কারণ। রাজধানীতে হাইড্রলিক হর্ণের বিরুদ্ধে একাধিক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হলেও এর ব্যবহার এখনো বন্ধ করা যায়নি। রেলগাড়ি, ভারি যানবাহন, জেনারেটর, মাইক, সাইরেন, কলকারখানা, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের মেশিন, গাড়ির হর্ন, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ব্লেন্ডার মেশিন, বৈদ্যুতিক ছুরিসহ বহু আধুনিক যন্ত্রপাতিও ঢাকার শব্দ দূষণের কারণ।
- ঢাকায় গাড়ীর অত্যধিক হর্ণ বাজানো শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। অন্যান্য যে কোনো শহরের তুলনায় ঢাকার চালকরা হর্ণ বাজান বেশি। রাজপথ ব্যবহারকারীদের ট্রাফিক আইন মেনে না চলাটাই বেশি বেশি হর্ণ বাজানোর জন্য দায়ী । ঢাকার পথচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার হন না । হঠাৎ করে দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হতে চান । রিক্সা ও স্কুটারগুলো কোন রকম সতর্কীকরণ ছাড়াই নিজেদের ট্রাক ছেড়ে দ্রুতযানের ট্রাকে ঢুকে পড়ে । অধিকাংশ চালকই নিজের হাত ও বাতির সঠিক ব্যবহার করেন না ফলে জান বাচানোর জন্য হর্ণের উপর হাত দিয়ে রাখা ছাড়া চালকদের কোন গত্যন্তর থাকে না । ফলে শব্দ দূষণের সৃষ্টি হয় ।

- শব্দবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন শব্দযন্ত্রের গগনবিদারী চিৎকার ঢাকার শব্দ দূষণের আরেকটি কারণ। যেখানে সেখানে উচ্চস্বরে মাইক বাজানোও শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ ।

৬.২ শব্দ দূষণে সৃষ্ট সমস্যা

শব্দ দূষণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাবাসী বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন । সমস্যাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ।

- শব্দ দূষণ মহানগরীতে বধিরতার হার বৃদ্ধি করছে । অসহনীয় শব্দকম্পনাঙ্কের কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সিলিয়ারগুলো ক্রমশ অকেজো হয়ে পড়তে থাকে । প্রথমে কানে শোনার মাত্রা কম হলেও এক পর্যায়ে মানুষ চিরতরে বধির হয়ে যায় । এমনকি কানের পর্দা ফেটেও যেতে পারে । নষ্ট হয়ে যায় মানুষের শ্রবণশক্তি । আর একবার যদি শ্রবণশক্তির নষ্ট হয়ে যায় তবে তা চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে । শব্দ দূষণের কারণে শুধু বধির হওয়া কিংবা চিরতরে শ্রবণযন্ত্র নষ্ট হওয়াই নয়-দূষণ সৃষ্টি করে আরও হাজারো পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা ।

- শব্দ দূষণের ফলে হৃদরোগে আক্রান্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । বহু বছরের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, হৃদরোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে শব্দ দূষণ । তীব্র শব্দ কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে তোলে । এতে করে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন রক্তে কোলেস্টোরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত হৃদরোগের জন্য দায়ী ।

- শব্দ দূষণের ফলে ধমনীর কাঠিন্য রোগের সৃষ্টি করে । উচ্চ শব্দে হৃদকম্পন বেড়ে যায় । ফলে হৃৎপিন্ডে ফাটল ধরতে পারে । একই কারণে মস্তিস্কে ঝাঁকুনি লেগে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । উচ্চ শব্দে নিউরো কোষ ভেঙ্গে গিয়ে হাড়ে ফাটল হতে পারে । তাছাড়া লিভার, পাকস্থলী ও প্লীহার জন্যও উচ্চ শব্দ ক্ষতিকর ।

- শব্দ দূষণের ফলে বদহজম, পেপটিক, আলসার, মাথা ঝিমঝিম করা, চিরস্থায়ী মাথা ব্যথা, এ্যাজমাসহ মানসিক চাপের সৃষ্টি হতে পারে । শব্দদূষণের কারণে রক্তরসে বা প্লাজমীয় এ্যাডরেনাল নামক এক ধরনের হরমোন ক্ষরণ বেড়ে যায় । ফলে হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ

বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শব্দে রক্তনালীগুলো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং মাংসপেশী উত্তেজনায় কঠিন হয়ে পড়ে ।

- শব্দ দূষণে আক্রান্ত হন গর্ভবতী মায়েরাও । প্রচন্ড শব্দে গর্ভপাত ঘটার আশঙ্কাও রয়েছে । গর্ভজাত সন্তান উচ্চ শব্দের কারণে বধির হয়ে জন্ম নিতে পারে ।
- শব্দ দূষণ ভয়াবহ মানসিক রোগেরও সৃষ্টি করতে পারে । তীব্র শব্দে রক্তে এ্যাডরেনাল হরমোন নিঃসরণ বেড়ে গেলে মানসিক অস্থিরতা ও স্নায়বিক উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয় । ফলে দুর্বলতা, বিরক্তি, ক্রোধ, উদ্বিগ্নতা, হতাশা, টেনশন, উত্তেজনা, অবসাদ ইত্যাদি মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে । শব্দদূষণ থেকে সৃষ্ট মানসিক চাপ খুব সহজেই আত্মহত্যার প্রবণতায় আক্রান্ত করতে পারে ।
- স্বাভাবিক কাজকর্মে উৎকট শব্দ বাধার সৃষ্টি করে এবং বিরক্তি ও উত্তেজিত করে তোলে । শিশু ও রোগীদের জন্য শব্দদূষণ মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে । শব্দ দূষণের কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে না পারার সমস্যা দেখা দেয় ।

৬.৩ শব্দ দূষণ থেকে রক্ষার উপায়

ঢাকার শব্দ দূষণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিচের ব্যবস্হাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :-

- হাইড্রলিক হর্ণের উৎখাতের পাশাপাশি ট্রাফিক আইনের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধিই কেবল ঢাকার শব্দ দূষণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনতে পারে ।
- পরিবেশ আইন যথাযথ ভাবে মেনে চলা ।
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সামাজিক ও গণ সচেতনতা শব্দদুষণ রোধ করতে পারে ।

৭.০ ময়লা আবর্জনা দূষণ

ঢাকার অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে থাকে ময়লা আবর্জনা, ম্যানহোলের উপচেপড়া পয়ঃবর্জ্যে ঢাকায় টেকা দায় । ছড়ানো ছিটানো ময়লা আবর্জনার গন্ধে ঢাকার

অধিকাংশ এলাকায় আজকাল স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলারও উপায় নেই । কোন কোন এলাকার ফুটপাথগুলো পরিণত হয়েছে রীতিমতো ময়লার ভাগাড়ে। পাড়া-মহল্লাগুলোতে এখন আর ডিসিসির ক্লিনারদের তেমন দেখা যায় না। অগত্যা নগরীর প্রায় সব এলাকার বাসিন্দাই নিজেদের ব্যবস্থাপনায় বাড়িঘরের আবর্জনা সিটি কর্পোরেশনের ডাষ্টবিন বা গার্বেজ কন্টেনারে ফেলে আসেন । কিন্তু সেখান থেকেও ময়লা-আবর্জনা ঠিকমতো সরানো হয় না । অধিকাংশ ডাষ্টবিন ও গার্বেজ কন্টেনারে প্রায় সব সময়ই ময়লার স্তূপ জমে থাকে । এসব দেখারও যেন কেউ নেই। যার ফলে ঢাকা শহর ময়লা আবর্জনার শহরে পরিণত হচ্ছে । ঢাকা শহরের লোকজনের তুলনায় ডিসিসির লোকবল ও সরঞ্জাম খুবই অপ্রতুল । এই অবস্থার জন্য ঢাকা শহরে ঠিকমত ময়লা আবর্জনা পরিস্কার হয় না ফলে ঢাকা শহরের ময়লা আবর্জনার দূষণ বাড়ছে। ময়লা ফেলার জন্য ডিসিসির লোকবল ও সরনযামের একটা চিত্র সারণী-১২ তে তুলে ধরা হল ।

সারণী-১২: রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ময়লা আবর্জনা পরিস্কারে ডিসিসির লোকবল ও সরঞ্জাম ।

লোকবল ও সরঞ্জাম	সংখ্যা
ডাষ্টবিন	৪ হাজার
ডিমাউন্টেবল গার্বেজ কন্টেনার	৪২০টি
ট্রাক	২২৪টি
কন্টেনার ক্যারিয়ার	১২৮টি
ড্রাইভার	সাড়ে ৩শরও বেশী
হ্যান্ডট্রলি বা হাতগাড়ি	৩ হাজার
ক্লিনার	প্রায় ৭ হাজার

উৎস : ডিসিসি, ২০০২ ।

ঢাকার বিভিন্ন এলাকার অধিকাংশ ডাষ্টবিন এবং গার্বেজ কন্টেনারেই ময়লা-আবর্জনার স্তূপ । কোন কোন স্হানে দিনের বেলাতেই ট্রাকে তোলা হয় ময়লা । ফুটপাথে ময়লা-আবর্জনার কারণে মানুষ হাঁটতে পারছে না । উল্লেখ্য যে, নগরীতে দিনে ১০ লাখ ঘনমিটার পয়ঃবর্জ্য তৈরী হলেও মাত্র সোয়া লাখ ঘনমিটার নিস্কাশনের ক্ষমতা ওয়াসার রয়েছে । এ ক্ষমতারও মাত্র ৫০ শতাংশ ব্যবহার

করতে পারে ওয়াসা । এই অবস্থায় ঢাকা নগরীতে ২০১০ সালের পর সুস্থ মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে । ঢাকাতে শিল্পকারখানা, গৃহস্থালী ছাড়াও হাসপাতালগুলোর ব্যাপক ময়লা আবর্জনা উৎপাদন করছে । যাদের পরিবেশিক প্রভাব মারাত্মক । সারণী -১৩ তে ঢাকার হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর উৎপাদিত বর্জ্যের বিভাজন দেখানো হল ।

সারণী - ১৩ : হাসপাতালসমূহে উৎপাদিত বর্জ্যের বিভাজন ।

বর্জ্যের শ্রেণী	বর্জ্যের বিবরণ	উৎপাদনকারী
সাধারণ বর্জ্য	পেপারক্লথ,বাক্স,প্যাকিং, ঔষধ কনটেনার, পলিথিন এবং রান্না ঘরের আবর্জনা।	প্রশাসন /ল্যাবরেটরী
প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	টিস্যু, বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ, রক্ত	রোগী /ল্যাবরেটরী
ইনফেক্শন বর্জ্য	সার্জারীর বিভিন্ন উপাদান, ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ইত্যাদি	রোগী /ল্যাবরেটরী
সাইটোক্সিক	তারিখ অতিক্রম হয়ে গেছে এমন ঔষধসমূহ	রোগী /ল্যাবরেটরী
ফার্মা ইলেকট্রিক্যাল	বিভিন্ন নিউক্লিয়ার মেডিসিন বর্জ্য, এক্সরে বর্জ, কঠিন, তরল, গ্যসীয় বর্জ্য ইত্যাদি	প্রশাসন/ ল্যাবরেটরী
ধারালো বর্জ্য	সুঁচ, সিরিঞ্জ, কঙ্কাল, ব্লেড, ভাঙ্গা গ্লাস, নখ ইত্যাদি	রোগী এবং ল্যাবরেটরী
তরল বর্জ্য,	তরল বর্জ্য রক্ত, পূঁজ, বমি, জীব শরীরের জলীয় তরল পদার্থ ইত্যাদি	রোগী, ল্যাবরেটরী, সেবা প্রদানকারী কর্মচারী

উৎস : বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা নভেম্বর ২০০১ হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ তিনটি হাসপাতালের উপর একটি সমীক্ষা । সৈয়দা পাপিয়া নাহিদ পপি ও মহামায়া আচার্য্য।

৭.১ ময়লা আবর্জনা দূষণের কারণ

ঢাকার ময়লা আবর্জনা দূষণের কারণগুলো হল :-

- ডিসিসিতে ক্লিনাররা ময়লা আবর্জনা পরিস্কার না করে কাজে ফাঁকি দেয় । বিষয়টি অনেক পুরনো । কোন কোন অসৎ ইন্সপেক্টর এবং

ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে ক্লিনাররা কাজ না করে বিল হাতিয়ে নেয় বলে জানা গেছে । ফলে ময়লা আবর্জনা ডাষ্টবিনে থেকে যায় এবং পরিবেশ দূষণ হয় ।

- ময়লা আবর্জনা দূষণের জন্য ডিসিসির ড্রাইভাররাও দায়ী । ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিযোগটি পাওয়া গেছে ডিসিসির ড্রাইভারদের বিরূদ্ধে। ট্রাকগুলোর প্রতিদিন ২ ট্রিপ করে এই কাজে সময় দেয়ার কথা থাকলেও দৈনিক এক ট্রিপের বেশি ময়লা টানা হয় না । যার ফলে ঢাকা শহর ময়লার স্তূপে পরিণত হচ্ছে ।
- অবৈধ দখলদারদের দৌরাত্ম্যে রাস্তা সঙ্কুচিত হওয়ার ব্যাপারও ময়লা আবর্জনা দূষণের কারণ । বাড়ি করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ রাস্তায় ফেলে রাখা, বড় বড় গাড়ির গ্যারেজ না থাকায় রাস্তার পাশেই গ্যারেজ করা মানুষের আরও কষ্টের কারণ ।
- নগরীর স্যুয়ারেজ অবস্হা ভাল নয় এর ফলে ময়লা আবর্জনা দূষণ বাড়ছে । সুষ্ঠ পয়ঃনিষ্কাষন ব্যবস্থার অভাবে নগরীতে ময়লা আবর্জনা দূষণ বাড়ছে ।
- ময়লা আবর্জনার কোন সুষ্ঠ ব্যবস্হাপনা না থাকার কারণও এ দূষণের জন্য দায়ী।
- বর্তমানে সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকারক বর্জ্য দূষণ হচ্ছে হাসপাতালের বর্জ্য। ঢাকাসহ সারাদেশের কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কোন ধরনের সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্হাপনা নেই যার ফলে বর্জ্য দূষণের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে ।
- ঢাকার অতিরিক্ত জনসংখ্যা ।
- গণসচেতনতার অভাব ইত্যাদি ।

৭.২ ময়লা আবর্জনা দূষণে সৃষ্ট সমস্যা

ঢাকার ময়লা আবর্জনা দূষণের কারণে নিচের সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে:-

- ময়লা আবর্জনা দূষণে টাইফোয়েড, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, বহুজাতের কৃমি, ভাইরালজন্ডিস সহ নানাবিধ পেটের পীড়া ছড়িয়ে পড়ছে ।

- স্বাস্থ্য সম্বন্ধ্যে ব্যাপক অজ্ঞতার কারণে পানি, খাদ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিশছে পয়ঃবর্জ্য ও ময়লা আবর্জনার বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদান। এবং এর তাৎক্ষণিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল বাসিন্দা ।
- ময়লা আবর্জনা পঁচে নগরীতে মশা-মাছির সৃষ্টি করেছে ।
- ময়লা আবর্জনা ডাষ্টবিন ছাড়াই ফেলার কারণে দুর্গন্ধে নগরজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে ।

৭.৩ ময়লা আবর্জনা দূষণ রক্ষার উপায়

ময়লা আবর্জনা দূষণ থেকে রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- বাসাবাড়ির ময়লা রাতের বেলা ফেলার ব্যবস্হা করা যেতে পারে । এই আহবান জানালে সেই অনুরোধে সকলেই সাড়া দেবে। আসলে দিনের বেলা ময়লা ভর্তি ট্রাক কেউ দেখতে চায় না ।
- শিল্প এলাকার সলিড ও তরল বর্জ্য ট্রিটমেন্ট বা দূষণমুক্ত না করে পরিবেশে ছাড়া যাবে না ।
- ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ।
- নিদিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- পলিথিন-প্লাষ্টিকের ব্যাগ বা অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাওয়ার পর তা যত্রতত্র নিক্ষেপের ফলে পয়ঃ নিষ্কাশন নালা বন্ধ হয়ে শহরে জলাবদ্ধতা ও তজ্জনিত দূষণ সৃষ্টির কারণ হচ্ছে । পলিথিন-প্লাষ্টিকের বিকল্প ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে অথবা এগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- সর্বোপরি ব্যাপক জনসচেতনতা ও আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিপর্যস্ত মহানগরীকে ময়লা অবর্জনা পরিস্কার করে বসবাসের উপযুক্ত করতে সক্ষম হব ।

৮.০ এ্যাপার্টমেন্টের পারিবেশিক সমস্যা

ঢাকা শহরে আবাসন সমস্যার সমাধানে মূলতঃ অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা শুরু হয় । এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাতাগণ তাদের

ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু পারিবেশিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পারিবেশিক এ সমস্যাবলীকে দুটি দৃষ্টিকোণ হতে দেখা যায় যথা ঃ-

- অ্যাপার্টমেন্টে অভ্যন্তরিণ গঠনগত সমস্যা ।
- অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা সৃষ্ট বাহ্যিক পারিবেশিক সমস্যা ।

৮.১ এ্যাপার্টমেন্টের আভ্যন্তরিণ গঠনগত সমস্যা

অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণে স্থাপত্যিক চিন্তার পাশাপাশি নগর পরিবেশ, নিজস্ব কাঠামো, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য দুর্ঘটনা হতে বাঁচার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কিন্তু ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে গড়ে উঠা অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে বেশ কিছু গঠনগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে । যার ফলে অ্যাপার্টমেন্টবাসীগণ কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন । অ্যাপার্টমেন্টের গঠনগত সমস্যা তুলে ধরা হল ঃ-

- নীচু ছাদ এবং দেয়াল ১০ ইঞ্চি এর পরিবর্তে ৫ ইঞ্চি হওয়ায় প্রচন্ড গরম অনুভূত হয় ।
- জানালা ছোট, দরজা কম এবং কক্ষের সংখ্যা কম ।
- রুমের আয়তন ছোট এবং ড্রইং-ডাইনিংএক সাথে ।
- মোজাইক ও ফিনিশিং নিম্নমানের ।
- টয়লেট ছোট, সারভেন্ট টয়লেট নেই ।
- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং সুয়্যারেজ লাইন অপরিকল্পিত ও নিম্নমানের এবং পানির আলাদা মিটার নেই ।
- সিঁড়ি ও লিফ্ট স্বল্পপরিসরের । আবার কোথাও কোথাও লিফট্ও নেই । আলো বাতাসের অপর্যাপ্ততা ।
- জরুরী অবতরণের জন্য বিকল্প সিড়ি নেই। খোলা সিড়িঘর হতে সরাসরি ফ্লাটের দরজা । ফলে কোথাও আগুন লাগলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে । বারান্দর সংখ্যা কম ও স্বল্প পরিসরের । শিশুদের খেলা ধূলার জায়গা নেই । অবর্জনা ফেলার সুপরিকল্পিত ব্যবস্হা নেই ।
- নির্মাণগত ত্রুটির কারণে অনেক অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে ফাটল ধরেছে।

৮.২ অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা সৃষ্ট বাহ্যিক পারিবেশিক সমস্যা

- ঢাকা শহরে সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণে কোন জোনিং কন্ট্রোল না থাকায় তা শহরের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে উঠেছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৮৪ অনুযায়ী ইমারতের আচ্ছাদিত অংশের আয়তন হবে তার সাইটের দুই তৃতীয়াংশ এবং সাইটের আয়তন ৫ কাঠার অধিক হলে ইমারতের পাশ্চাৎদিকে ৪ মিটার এবং দুই পাশে ১.২৫ মিটার করে জায়গা ছাড়তে হবে । এছাড়া সুউচ্চ ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ৬ তলার উর্ধ্বে ইমারতের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আয়তন হ্রাস পাবে । অর্থাৎ ইমারতের সামনের দিকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে । কিন্তু বর্তমানে যে সকল সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট নির্মিত হচ্ছে তাতে রাজউক এর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা সুস্পষ্ট ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে । এই বিধিমালা লঙ্ঘন করে অ্যাপার্টমেন্টসমূহ সম্পূর্ণ সাইটের উপর উলম্বভাবে গড়ে উঠায় এগুলো পাশ্ববর্তী সংকীর্ণ রাস্তার সাথে গিরিখাত জনিত পরিবেশ সৃষ্টি করছে । এর ফলে বায়ুপ্রবাহ এবং বায়ু দূষক সমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পরিবেশকে দূষিত করছে ।
- সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্টের পাশে অবস্থিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের ইমারতসমূহে স্থায়ী ভাবে আলো-বাতাস চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায়, এর বাসিন্দাগণ স্নায়ুরোগ, ভাইরাস জনিত বিভিন্ন রোগ ও হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং সে সাথে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ইমারত বাসিন্দাদের প্রাইভেসীও নষ্ট হচ্ছে।
- ঢাকা শহরে নির্মিত সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে সাধারণতঃ অধিক আয়ের লোকজন বাস করে । গ্রীষ্মকালে অস্বস্তিকর আবহাওয়া হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদের অনেকেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বাবহার করে থাকে । এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে অ্যাপার্টমেন্ট কক্ষের আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ু বাইরে বের হয়ে যাবার ফলে তা পার্শ্ববর্তী এলাকার আর্দ্রতার স্তরকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে । এর ফলে অ্যাপার্টমেন্টের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনকে গ্রীষ্মকালে খুবই অসহনীয় পরিবেশে বাস করতে হয় ।

৯.০ উপসংহার

রাজধানী নগরী হিসাবে ঢাকা বর্তমানে সুরম্য অট্টালিকা, মার্কেট তথা প্লাজা ও কমিউনিটি সেন্টারে ভরপুর হলেও এর বিশাল আঙ্গিনা আজ নানা দুর্ভোগের শিকার। পৃথিবীর সকল দেশেই রাজধানী শহরকে একটি শো-পিস হিসাবে তুলে ধরা হয়। সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট, সুন্দর যোগোযোগ ব্যবস্হা, সুন্দর দোকানপাট এগুলো যে কোন রাজধানী শহরের অলঙ্কার । কিন্ত ১ (এক) কোটি লোকের বাস বর্তমানে মেগাসিটি ঢাকার দিকে তাকালে আমরা দেখি সম্পূর্ণ বিপরীত এক চিত্র । অথচ রাজধানীর বেশির ভাগ মানুষেরই রয়েছে সুন্দর পরিবেশের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ। উদাহরণস্বরূপ ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৃক্ষমেলার কথাই ধরা যাক, এই বৃক্ষমেলায় রেকর্ড পরিমাণ চারাবৃক্ষ বিক্রি হয়েছে । এই বিক্রির পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকার ওপরে । রাজধানীর মানুষ যে ক্রমশ বৃক্ষপ্রেমিক হয়ে উঠছে এটি তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু বর্তমানে ঢাকা নগরীর সড়ক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে । মেগা দূষণ নিয়ে ক্রমাগত মেগাসিটিতে পরিণত হচ্ছে আমাদের ঢাকা। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ঢাকা কেন্দ্রিকতা ইতিমধ্যেই ঢাকাকে অধিক জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত করে তুলেছে । বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ ছাড়াও ঢাকার বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালীর ডাম্পিংও ঢাকার পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ । আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানার অনুমোদন এ দূষণের মাত্রাকে কেবল বাড়িয়ে চলেছে । অন্যদিকে শিল্পকারখানায় পরিবেশ উপযোগী ব্যবস্থা না থাকার ফলে শিল্প বর্জ্যও আমাদের জীবনকে দূবিষহ করে তুলেছে। উন্নত বিশ্বে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মোট বিনিয়োগের ৪-৫ শতাংশ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য । জাতীয় আয়ের ২.২ শতাংশ তারা ব্যয় করে পরিবেশের উন্নয়নে । আমাদের দেশে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজন আজ এই ধরনের বাধ্যবাধকতা নিতান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে । ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ ডিজেল চালিত স্কুটার। সরকার এই স্কুটারের ব্যবহার সীমিত করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে । যথাযথ নগরায়নের জন্য উপযুক্ত রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, চিত্ত বিনোদন ব্যবস্থা, সহজলভ্য জ্বালানী, যথাযথ হাটবাজার প্রভৃতি সঠিকভাবে সরবরাহ ও ব্যবস্থাদির অবকাঠামো দূষণমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি গড়ে তোলা সহজ নয় কোনো অর্থেই । কিন্তু তা একেবারে অসম্ভবও নয়। সীমিত সামর্থ্য সত্তেও ঢাকার দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য দরকার সদিচ্ছা, যথার্থ উদ্যেগ, সুষ্ঠু মনিটরিং এবং সর্বোপরি নিজেদের দায়িত্ব পালনে ঢাকাবাসীর আন্তরিকতা । আদর্শ নগরায়নের জন্য এখন থেকে রাজউক, ডিসিসি ও সর্বোপরি সরকার পরিকল্পনা না নিলে রাজধানীতে আধুনিক নগরায়ন সম্ভব হবে না। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে ১৯৭৩ সালে পানি দূষণ অধ্যাদেশ, ১৯৯২ সালে

পরিবেশ নীতি ও ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন জারি করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের ২৮ আগষ্ট জারি করা হয় পরিবেশ অবক্ষয় ও দূষণ রোধে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা। এই সব নীতিমালা সকলেই মেনে চলতে হবে। তবে তার সাথে ঢাকার পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে গণসচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করতে হবে তবেই ঢাকা শহরের পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- দৈনিক প্রথম আলো, ২৯শে আগষ্ট ২০০২ ।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা ফেব্রুআরী ২০০১ ।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা জানুয়ারী ২০০৩ ।
- দৈনিক যুগান্তর, ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০২ ।
- বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০১, হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ তিনটি হাসপাতালের উপর একটি সমীক্ষা। সৈয়দা পাপিয়া নাহিদ পপি, মহামায়া আচার্য্য ।
- হোসেন, ম. ১৯৯৯, প্রবাহ ঢাকা, কালারটেক, মগবাজার ।
- Ahmed A. U. & Reazuddin 2002: Industrial Pollution of Water System in Bangladesh. In: Rahman A. A., Huq S. & Conway G.R.(ed.): Environmnetal System of Surface Water System of Bangladesh, UPL, Dhaka. pp.175-178.
- BBS 1998: Statistiacl Year Book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Palnning, Dhaka.
- Islam, N 1996 "Dhaka: From city to Meyacity", Dhaka, Urban studies programme, Department of Geography, University of Dhaka.
- Kamal A.K.M.M. 1997. A study on disposal of Hospital Nipsom Library Dhaka.

  Planning Commission, 1991. "Task Force on Social Implications of Urbanization in Bangladesh", Dhaka : Government of Bangladesh.
- Solid Waste Disposal in District Health Facilities: 1994, World Health form.
- UNEP 2001: State of the Environment – Bangladesh, UNEPRRC, AP Thailand.